XXNE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯২ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা বুধবার ১৭ বৈশাখ ১৪২০ শিলিগুড়ি

# গণতন্ত্রের লজ্জা

স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব— ফরাসি বিপ্লবের সময় এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়া স্লোগান তৈরি হইয়াছিল। পরবর্তী সওয়া দুইশত বৎসরে তাহাই রেওয়াজ হইয়াছে। সকলেই তিনটি শ্রুতিমধুর শব্দ জুড়িয়া স্লোগান দিয়া থাকে। ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই)-ও ব্যতিক্রম নহে। সংস্থাটির মন্ত্র: পরিশ্রম, নিরপেক্ষতা এবং সততা। ৩০ এপ্রিল দ্বিপ্রহরের পর সংশয় হইতে পারে, তবে কি শব্দ তিনটি নেহাতই কথার কথা? নচেৎ কেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তাহাদের এই মর্মে তিরস্কৃত হইতে হইবে যে তাহারা সুপ্রিম কোর্টের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে? কেন মহামান্য বিচারকরা বলিতে বাধ্য হইবেন, দেশের সর্বোচ্চ তদন্ত সংস্থার ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছে? এই তিরস্কারের মুহূর্তটি ভারতীয় গণতন্ত্রের চরম লজ্জাকর মুহূর্তগুলির একটি। কয়লা বণ্টন সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্তের ভার সি বি আই-এর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। মার্চ মাসে সংস্থাটি সুপ্রিম কোর্টকে জানাইয়াছিল, তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট কোনও রাজনীতিকের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। এপ্রিলের শেষ প্রান্তে আসিয়া সংস্থা আদালতে হলফনামা পেশ করিয়া বলিল, রিপোর্টটি আইনমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার দেখিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং কয়লা মন্ত্রকের কিছু আমলাও দেখিয়াছেন। কারণ, 'তাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন'। এই অসঙ্গতিতে আদালত সঙ্গত কারণেই উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের আরও বড় একটি কারণ সি বি আই-এর উপর 'রাজনৈতিক প্রভু'-দের নিয়ন্ত্রণ। সুপ্রিম কোর্ট যে ভাষায় সি বি আই-কে তিরস্কার করিয়াছে, তাহা কার্যত অভূতপূর্ব। মহামান্য বিচারকরা বলিয়াছেন, সি বি আই-কে মুক্ত হইতে হইবে, স্বাধীন হইতে হইবে। তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে সি বি আই যে কাহারও নির্দেশের অধীন নহে, আদালত কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

এই তিরস্কার সি বি আই-এর প্রাপ্য। কয়লা বণ্টন মামলাতেই যে তাহাদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রথম প্রকাশ পাইল, তাহা নহে। যে সংস্থা প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের তদন্ত করিতে পারে, তাহা কেন শাসক দলের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে? সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলিয়াছে, আইনমন্ত্রী বা কোনও সচিব কি সি বি আই-এর তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট দেখিতে চাহিতে পারেন? তাহার সহিত আর একটি প্রশ্ন জুড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন— মন্ত্রী দেখিতে চাহিলেও সি বি আই দেখাইবে কেন? উত্তরটি আনুগত্যে আছে। রাজনৈতিক আনুগত্য বহু পথে জন্মাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যদি সি বি আই-এর ন্যায় সংস্থার নির্দেশক নিয়োগের অধিকার থাকে, তবে তাহা আনুগত্য আদায়ের একটি পথ হইতে পারে বটে। সি বি আই-এর নির্দেশক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন। তাহার মাধ্যমেও সরকার সংস্থাটিকে অন্যায় পথে চালনা করিতে পারে। সমাধান কোথায়? চটজলদি উত্তর বলিবে, নির্দেশক নিয়োগের পদ্ধতিটি বদলানো হউক। হয় সি বি আই সম্পূর্ণ স্বশাসিত হউক, অথবা তাহা সুপ্রিম কোর্টের অধীনে থাকুক। তদন্তকারী সংস্থার সহিত সরকারের উচ্চাবচ সম্পর্কটি বিচ্ছিন্ন হউক।

সি বি আই নিজেদের এমনই অতলে লইয়া গিয়াছে যে উপরোক্ত বিকল্পগুলি অতি গ্রহণযোগ্য বোধ হইতেছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিকল্পগুলি গণতন্ত্রের মাহাত্ম্যকে খর্ব করে। আইন বাঁধিয়া ন্যায় নিশ্চিত করা অসম্ভব। সি বি আই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকুক, কিন্তু সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে সেই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কখনও ব্যবহৃত হইবে না। সি বি আই স্বাধীন ভাবে কাজ করিবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত করিবে, প্রয়োজনে অতি গুরুত্বপূর্ণ নেতাকেও দোষী সাব্যস্ত করিবে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহাকে ব্যবহার না করিবার মধ্যেই প্রকৃত পরিণতমনস্কতার প্রকাশ। ভারতীয় নেতারা সেই আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখিয়াছেন কি না, তাহাই গণতন্ত্রের পরীক্ষা। ভারতকে আজ সেই পরীক্ষায় বসিতেই হইবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে যে সি বি আই তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়াছে। সি বি আই-এর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতাই গণতন্ত্রের প্রহরী। সেই নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। এই মুহূর্ত হইতে সি বি আই-কে স্বাধীন হইতে দিন।

# অনর্থক উত্তেজনা

লাদাখ সীমান্তে চিনা গণমুক্তি ফৌজের 'অনুপ্রবেশ' এবং তাঁবু গাড়িয়া ফেলার সংবাদ লইয়া হইচই হইতেছে। দেশের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি তো বটেই, এমনকী ইউপিএ-র সমর্থক বলিয়া মান্য সমাজবাদী পার্টিও এই প্রশ্নে ভারত যথেষ্ট রণোন্মাদনা দেখাইতেছে না বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। ভারতীয় বাহিনী কেন এখনই অনুপ্রবেশকারী চিনা ফৌজকে চ্যালেঞ্জ জানাইতেছে না, জানিতে চাহিয়া সরকারকে 'দুর্বলচিত্ত' ও 'দ্বিধাগ্রস্ত' বলিয়াও নিন্দা করা হইতেছে। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়াই এ ভাবে বিদেশনীতিকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের অধীন করার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ বাস্তব হইল, চিন-ভারত সীমান্তের রূপরেখাটি লইয়া কোনও দলীয় রাজনীতিকেরই বিশেষ ধারণা নাই। বিভিন্ন বৈঠকে পারস্পরিক ভিত্তিতে তাহা যে সকল শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সব বিস্তারিত তথ্য কাহারও কাছে সুলভ নহে। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা সত্যই 'অনুপ্রবেশ' কি না, তাহা লইয়াও সন্দেহ আছে। দিল্লি ও বেজিং-এর 'পন্থা' বিষয়ে এত কম তথ্য লইয়া সেই 'পন্থা' লইয়া বিক্ষোভ-উত্তেজনা চিত্তাকর্ষক হইলেও কাজের কাজ নহে।

আগামী সপ্তাহে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদের চিন সফর এবং তাহার কিছু কাল পর চিনা প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের নির্ঘণ্টও ক্রমশ সমীপবর্তী হইতেছে। সদ্য-সদ্য তিন সদস্যের এক ভারতীয় সামরিক প্রতিনিধিদল তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত চিনা সামরিক সদর-দফতর চেংডু সফর করিয়াছে। সফরে দুই দেশের সৈন্যদের লইয়া যৌথ মহড়ার নির্ঘণ্ট স্থির হইয়াছে, যাহার লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযান। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর তিনটি জলাধার নির্মাণের চিনা প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের উদ্বেগ লইয়াও দুই দেশের নদী-বিশেষজ্ঞরা আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসিতেছেন। এই সবের মধ্যেই সীমান্ত-বিরোধ লইয়া দুই দেশের আলোচনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই আলোচনার গোপনীয়তা এত যত্নসহকারে রক্ষিত যে তাহার সিদ্ধান্তসমূহ কোনও মতেই আমজনতার, এমনকী দলীয় রাজনীতিকদেরও অবগতির বিষয় নয়।

চিনে সম্প্রতি নেতৃত্বের পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বদাই পুরানো পন্থা হইতে কিছুটা পৃথক হন। সলমন খুরশিদ সেই পার্থক্য মাপিয়া দেখিতে প্রতিবেশীসুলভ কূটনৈতিক সফরে চিন যাইতেছেন। তথাকথিত 'অনুপ্রবেশ' বিষয়ক অস্বস্তি নয়াদিল্লি প্রকাশ্যেও করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আবার নূতন ভাবে সীমান্তরেখা বা নিয়ন্ত্রণরেখা লইয়া অনাবশ্যক জেদের লড়াই চালানো বোকামি নয় কি? চিনের কাছে ভারত এক অনুল্লেখযোগ্য প্রতিবেশী, তাই অর্ধ শতাব্দী পূর্বের যুদ্ধের স্মৃতিটি চিনা জনমানসে উবিয়া গিয়াছে, চিনা রাজনীতিতে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ভারতীয় রাজনীতিকদের যে সেই যুদ্ধের প্রলম্বিত ছায়া প্রত্যহ আরও বেশি করিয়া তাড়া করিতেছে, এবং যুদ্ধের জুজু দেখাইতেছে, ইহাই কি ভারতীয় মানসে চিনের বিরাট জয় নহে?

# ক্ষুদ্র ঋণের বাজারে ক্ষতি না হয়ে যায়

**অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈত্রীশ ঘটক**

**টাকাপয়সা নিয়ে যারা কারবার করে, তেমন যে কোনও সংস্থা থেকে দূরে থাকার একটা মানসিকতা এখন পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হতে পারে, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাও যা থেকে রেহাই পাবে না। এটা খুবই চিন্তার কথা।**



পশ্চিমবঙ্গের অর্থলগ্নির বাজারে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুব বড় রকমের অনিশ্চয়তার শিকার হয়েছেন। অধিকাংশেরই সঞ্চয় অল্প, অনেকেই নিতান্ত দরিদ্র। এখন তাঁদের আর্থিক বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর জন্য রাজ্য সরকার একটি ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগটি নিয়ে তর্ক উঠেছে। অর্থাভাবে যে সরকারকে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হয়, সে এ ধরনের উদ্যোগে টাকা খরচ করলে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে কী ভারতে, কী অন্য দেশে, সরকার এ-রকম করেই থাকে। ব্যাঙ্ক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের দোষে বিপাকে পড়লে সরকার তাদের পাশে দাঁড়ায়। বলা হয়ে থাকে, তারা 'টু বিগ টু ফেল'— এত বড় প্রতিষ্ঠান লাটে উঠলে অর্থনীতিতে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এখন, যথেষ্ট বড় বলে কেউ সর্বনাশ করেও পার পেয়ে যাবে, আর অল্প টাকা জমিয়েছেন বলে বিপন্ন আমানতকারীদের কোনও গুরুত্ব নেই, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর দায় নেই— এটা একটু অন্যায় কথা হল না কি? এটা ঠিকই যে, দুটো ভুল মিলে একটা ঠিক হয় না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ক্ষতিপূরণের রীতি ইদানীং যে-রকম চলছে, তাতে এই ক্ষতিপূরণের উদ্যোগটির বিরুদ্ধে খুব কড়া অবস্থান নেওয়া বোধহয় উচিত নয়।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পসঞ্চয়ের হার অনেক বেশি, জনসংখ্যার অনুপাতেই দেখি অথবা মোট উৎপাদনের অনুপাতেই দেখি। ২০১১'র হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশের বাস, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি) বা কার্যত জাতীয় আয়ের ৬.৭ শতাংশ আসে এই রাজ্য থেকে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক আমানতের অঙ্ক সারা দেশের ২২ শতাংশ। এহ বাহ্য। সম্প্রতি রাজ্যে একটি সমীক্ষায় প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ বলেছেন, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার মতো উপার্জন তাঁদের নেই— মনে হয়, আমানতের অঙ্ক কম হলে ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর পাত্তা দেয় না। আবার, যাঁদের ব্যাঙ্কে আমানত আছে, গত কয়েক বছরে তাঁরা দেখেছেন, চড়া মূল্যস্ফীতি তাঁদের সুদের টাকা বহুলাংশে খেয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃত সুদের হার অনেক কমে গিয়েছে। স্বল্পসঞ্চয়কারীরা এমন কোথাও টাকা রাখতে চেয়েছেন যেখান থেকে ভাল আয় হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মওকা পেয়ে অসাধু আর্থিক সংস্থাগুলি লোক ঠকানোর কারবার ফেঁদেছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য সরকার কী করতে পারে। যে সব সংস্থা আমানত রাখে, তাদের উপর অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করা অবশ্যই জরুরি। একটি সংস্থা যে নির্ভরযোগ্য, সেটা যথেষ্ট ভাল ভাবে যাচাই করে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার, সেই স্বীকৃতি সম্পর্কে মানুষকে যথেষ্ট অবহিত করা দরকার, যাতে সবাই জানতে পারেন কাদের উপর ভরসা করা যায়। একই সঙ্গে, এটাও পরিষ্কার করে সবাইকে জানানো দরকার যে, যাদের প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি নেই সেই সব সংস্থায় টাকা রেখে বিপদে পড়লে সরকার কোনও ক্ষতিপূরণ দেবে না। সেবি বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতো কোনও অরাজনৈতিক এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এই স্বীকৃতি দানের আয়োজনটিতে জড়িত রাখা উচিত, তারা যে জড়িত আছে সেটা জনসাধারণকে যথেষ্ট ভাল করে জানানো উচিত। অন্য দিকে, কী ভাবে স্বল্পসঞ্চয়কারীরা সহজে কার্যকর ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন, তার বন্দোবস্ত করতে হবে। এ জন্য মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের মতো নতুন ধরনের উপায় কাজে লাগানোর কথা ভাবা যায়।

**সম্প্রতি রাজ্যে একটি সমীক্ষায় প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ বলেছেন, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার মতো উপার্জন তাঁদের নেই— মনে হয়, আমানতের অঙ্ক কম হলে ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর পাত্তা দেয় না।**

এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরির সময় আমাদের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলি অল্প আয়ের মানুষদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিয়ে-থা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্যই হোক, গেরস্থালির সরঞ্জাম কিনতেই হোক অথবা ছোটখাটো ব্যবসার প্রয়োজনেই হোক, মানুষকে ধার করতে হয়। ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলি তুলনায় কম সুদে সেই ধার দিয়ে থাকেন। এটা স্বভাবতই তাঁদের খুব কাজে লাগে। যারা লোকের কাছ থেকে আমানত নিয়ে কারবার করে, এই ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলির সঙ্গে তাদের মৌলিক তফাত আছে। কিন্তু বিপদ হল, এখন পশ্চিমবঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে যারা কারবার করে তেমন যে কোনও সংস্থা থেকে দূরে থাকার একটা মানসিকতা তৈরি হতে পারে, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাও যা থেকে রেহাই পাবে না। সেটা কিন্তু অন্যায়, অবাঞ্ছিতও। ক্ষুদ্র ঋণের কারবারিদের আমানত নেওয়া আইনত নিষিদ্ধ, সুতরাং আইনত তারা কোনও পন্‌জি স্কিম চালু করতেই পারে না। তারা অন্য ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে। যেমন অতিরিক্ত ঋণ দিয়ে ফেলে অনেকে বিপদে পড়ে, অনাদায়ী ঋণ শোধের জন্য বেআইনি ভাবে জবরদস্তি চালিয়ে সামাজিক সমস্যা ডেকে আনে। অন্ধ্রপ্রদেশে সাম্প্রতিক কালে এমন হয়েছে। কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ অন্য সমস্যা, সমাধানের পথও একেবারে অন্য রকম। বিশেষত, অতিরিক্ত ঋণ দিয়ে ফেললে ঋণদাতাদেরই লোকসান হয়, অনেক সময় তারা আসলটাও ফেরত পায় না। অন্ধ্রপ্রদেশের অভিজ্ঞতার পরে ক্ষুদ্র ঋণের কারবারিরা সবাই এখন অতিরিক্ত ঋণ দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন অতি লোভে ব্যবসা নষ্ট। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ঋণের কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় স্তরে নতুন আইন চালু হয়েছে।

মোদ্দা কথা হল, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার কাছে যে সব স্বল্প আয়ের মানুষ ধার করেন, অসাধু আমানতের কারবারিদের পাপের ফল যেন তাঁদের ভুগতে না হয়। সেটা হবে আনুষঙ্গিক ক্ষতি। যাকে বলে, 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'। একাধিক অর্থে।

*অভিজিৎবাবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'তে অর্থনীতির শিক্ষক; মৈত্রীশবাবু ইংল্যান্ডে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক*

# শ্রম দিবস কবে পেশা বাছার সুযোগ দেবে

**অমিতাভ গুপ্ত**

**পছন্দের পেশা বাছার অধিকার না থাকলে সমাজের পারস্পরিক বিশ্বাসের স্তর ক্রমে নামতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উন্নয়নের ভিতটাই নড়ে যায়। রাজনীতির জালে জড়িয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ কি সে পথেই চলেছে?**

আসুন, আজকের সকালটা একটু অন্য ভাবে শুরু করা যাক। আপনার বাড়িতে যে মহিলা ঠিকে কাজ করতে আসেন, তাঁকে ডাকুন। তাঁর পরিবার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করুন। জানতে চান, তাঁর স্বামী কী করেন? বাবা কী করতেন? মা-ও কি ঠিকে ঝি-র কাজ করতেন/করেন? প্রতি মাসে মোট কত টাকা রোজগার করেন তিনি? কেন তাঁকে লোকের বাড়িতে ঠিকে কাজ করেই রোজগার করতে হয়?

দশ জনের মধ্যে ন'জনই যে উত্তরগুলো পাবেন, তা অনুমান করা যায়। আপনার কাজের মাসির বর রিকশা চালান, বা ঠিকে শ্রমিকের কাজ করেন। অনেকের বরেরই রোজগারের একটা বড় অংশ, সম্ভবত সবটাই, খরচ হয়ে যায় মদ-জুয়ার পিছনে। দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য লোকের বাড়ির কাজ ধরতে হয় বউদের। সম্ভবত তাঁদের মায়েরাও লোকের বাড়িতেই কাজ করতেন, বা এখনও করেন— কারণ তাঁদের সংসারের গল্পও একই রকম। সাত থেকে আটটা বাড়িতে কাজ করে মাসের শেষে রোজগার হয় পাঁচ হাজার টাকা।

কেন তাঁরা লোকের বাড়িতে ঠিকে ঝি-র কাজই করেন, জানতে চেয়ে উত্তরে একটা অবাক চাহনি পেয়েছেন বলেই অনুমান করছি। এই পেশা ছাড়া আর কিছু যে সম্ভব, এই মহিলাদের অধিকাংশই ভাবতে পারেন না। পারেন না অনেকগুলো কারণে। এক) তাঁরা চারপাশে দেখেছেন, তাঁদের মতো মহিলারা লোকের বাড়িতে কাজই করেন; দুই) অন্য কোনও চাকরির সুযোগ তাঁদের সামনে নেই; তিন) যে চাকরি রয়েছে, তা করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের নেই। ফলে, সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আট বাড়িতে কাজ করে মাসের শেষে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জনই তাঁদের একমাত্র পথ। সেই পথে কত অপমান রয়েছে, তাঁরা জানেন। আমরাও।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের মেয়েরাও ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কাজে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদেরও হাড়ভাঙা খাটুনি, তাঁদেরও উপার্জন খুব বেশি নয়। ফারাক হল, তাঁদেরটা বাড়ি-বাড়ি ঠিকে কাজ নয়। তাঁরা 'গারমেন্টস'-এ কাজ করেন। সে দেশে যবে থেকে এই গারমেন্টস কারখানা আরম্ভ হয়েছে, ৩০ লক্ষেরও বেশি মেয়ে কাজ পেয়েছেন। তাঁরাও তেমন লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু তাঁদের সামনে বিকল্প তৈরি হয়েছিল। আর, সেই বিকল্প বদলে দিয়েছে তাঁদের জীবন। সমাজ তাঁদের যে ভাবে দেখত, সেই ভঙ্গিটা বদলে গিয়েছে। বাড়ির বাইরে তাঁরা এখন অনেক জোরের সঙ্গে নিজেদের কথা বলতে পারেন, বাড়ির ভিতরেও। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও তাঁদের গলা শোনা যায়। একটা কারখানায় কাজ করার সুবাদে তাঁদের সামাজিক মেলামেশার গণ্ডিও ক্রমেই বড় হয়ে চলেছে। নতুন নতুন সুযোগের খবর তাঁদের কানে সহজে আসে।

আর সে দেশে যাঁরা শহরে থাকেন না, কারখানায় কাজের সুযোগ যাঁদের নেই, তাঁদের জীবনও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কল্যাণে কী ভাবে বদলে গিয়েছে, সে বিষয়ে ঢের কথা ইতিমধ্যেই হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আর ঢুকব না। একটা নতুন সুযোগ কী ভাবে জীবন বদলে দিতে পারে, এ পার বাংলার সঙ্গে ও পারের তুলনা করলে খুব স্পষ্ট হয়। এ পারে সেই সুযোগ পৌঁছবে কবে? কোন সীমান্ত পেরিয়ে?




পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে উন্নয়নের ট্রেন চলে গিয়েছে।

মার্চের শেষ রবিবার লোকাল ট্রেনে চড়ে কোথাও গিয়েছিলেন? না গেলেও, পর দিন সব খবরের কাগজে যে ছবি বেরিয়েছিল, চোখে পড়েছিল নিশ্চয়ই। সে দিন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের চাকরির পরীক্ষা ছিল। ৩৫,০০০ চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন কমপক্ষে ৪৫ লক্ষ মানুষ। তাঁদের অধিকাংশই কমপক্ষে স্নাতক, এবং স্বভাবতই প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চেয়েও কম আকর্ষণীয় কোনও পেশায় আছেন, অথবা নিতান্ত বেকার। তাঁদের সিংহভাগই জানতেন, রবিবারের ট্রেনে জীবন পণ করে উঠে চৈত্রের রোদে ঘেমেনেয়ে পরীক্ষা দেওয়াই সম্ভবত সার হবে, শেষ পর্যন্ত চাকরি পাবেন না। তবু, তাঁরা মরিয়া ছিলেন পরীক্ষা দিতে। কারণ, সম্মানজনক জীবিকার আর কোনও পথ, এই পশ্চিমবঙ্গে, তাঁদের সামনে নেই। প্রাইমারি স্কুলের চাকরি তাঁদের সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য করবে, সম্মাননীয় করবে। বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প যেমন করেছে। ফারাক হল, সে দেশে বাজার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, আর এ পার বাংলায় আমরা, আমাদের রাজনীতি দিয়ে, সেই সুযোগের রাস্তা আটকে রেখেছি প্রাণপণ।

পশ্চিমবঙ্গ এখনও আটকে আছে 'কৃষক আমাদের গৌরব, কৃষি আমাদের সম্পদ'-এর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। যে সিঙ্গুরের জমিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ উথালপাথাল হয়ে গেল, সেখানে একটা সমীক্ষা করেছিলেন অর্থনীতিবিদ মৈত্রীশ ঘটক। কারা শিল্পের জন্য জমি দিতে চান, অর্থাৎ পেশা বদলিয়ে কৃষি থেকে অন্য কিছু বেছে নিতে রাজি, আর কারা চান না— বিস্তারিত খোঁজ করেছিলেন তাঁরা। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ('শিল্প নেই, তাই বিকল্প কম...', ২৭/২ ও 'জমির ব্যাপারে সরকারকে থাকতেই হয়', ২৮/২) তিনি বলেছিলেন, তরুণ প্রজন্ম জমি বেচে দিতে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি ইচ্ছুক। অর্থাৎ, বিকল্প পেশা পেলে তাঁরা কৃষির মতো অ-লাভজনক পেশায় থাকতে চান না।

তবুও, তাঁরা কৃষিতেই আটকে পড়লেন। পড়বেনও। কারণ, বিকল্প পেশা তাঁদের সামনে নেই। যেটুকু আছে, সেই সুযোগ নেওয়ার মতো প্রশিক্ষণ তাঁদের নেই। রাজনীতির স্লোগান যতই তাঁদের জমির অধিকার রক্ষা করার কথা বলুক, সকালবেলা লোকের বাড়ি ঠিকে কাজ করতে যাওয়া মহিলাদের সঙ্গে এঁদের তফাত নেই— দু'পক্ষের কারও শ্রমের বাজারে নাম লেখানোর স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্র তাদের সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে দেয়নি। ইচ্ছেমতো পেশা বাছার স্বাধীনতা থাকলে তাঁদের কতখানি উন্নয়ন হত, সেই প্রশ্ন তো আছেই, অমর্ত্য সেন তাঁর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্রিডম'-এ লিখেছেন, কাজের বাজারে যোগ দিতে পারার স্বাধীনতাটাই উন্নয়নের একটা মস্ত বড় ধাপ। ভোট দিতে পারার মতোই।

পছন্দের পেশা বাছতে পারার স্বাধীনতা না থাকলেই বা ক্ষতি কী? দুনিয়া জুড়ে চলা বিভিন্ন সমীক্ষার দেখা গিয়েছে, সম্মানজনক (এবং লাভজনক) পেশা বাছার স্বাধীনতা যত কমে, ততই সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাসের মাত্রা কমতে থাকে, আলগা হয়ে যেতে থাকে সামাজিক বন্ধন, কমতে থাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা (সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০১৩)। সমাজে বিশ্বাস না থাকলে কী হয়, সিঙ্গুরের ১০০০ একর জানে। সেখানকার মানুষ বিশ্বাসই করতে পারেননি যে শিল্পের জন্য জমি দিলে তাঁদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে না। তাঁরা কাউকে বিশ্বাস করেননি— শাসক দলকে নয়, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসা প্রশাসনিক কর্তাদের নয়, জমি কিনতে চাওয়া শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নয়।

সেই অবিশ্বাস থেকে কী ভাবে জন্ম নিল এক আত্মঘাতী রাজনীতি, সে প্রশ্ন আপাতত থাকুক, কিন্তু অবিশ্বাসটাকে আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া ভাল। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ আমাদের সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাসের স্তর খুব নীচে। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষের এখনও সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার মতো জীবিকা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নেই বলেই কি এই অবিশ্বাস? প্রশ্নটা ভাবার মতো। সামাজিক বিশ্বাসের মাত্রা বেশি হলে লাভ অনেক— বাজার যেখানে অনিশ্চয়তার কারণে কাজ করতে পারে না, সেখানে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ এগিয়ে যেতে পারে; বিশ্বাস থাকলে দর কষাকষির খরচ কমে; আরও অনেক কিছু। প্রতিটাই উন্নয়নের জন্য অতি জরুরি। আজকের পশ্চিমবঙ্গে এই আলোচনা অলীক বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাসের মাটিতে। মুখ্যমন্ত্রী পণ করেছেন, তিনি শিল্পের জন্য সূচ্যগ্র জমি অধিগ্রহণ করে দেবেন না। তাঁর এই পণের মূল কারণটি ভোটারের মন পাওয়া, তা নিয়ে সম্ভবত কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু মন পাওয়ার পথটি তাৎপর্যপূর্ণ। বেসরকারি শিল্প এলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে— অবিশ্বাসপ্রসূত এই ধারণাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পণ। তিনি বলতে পারতেন, বেসরকারি শিল্পকে আসার ব্যবস্থা করে দেব, কিন্তু সেই শিল্পে যাতে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের চাকরি হয়, তা-ও নিশ্চিত করব। তার জন্য তাদের লেখাপড়া শেখাব, পেশাদারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। তিনি বলেননি। এই রাজ্যের কোনও নেতাই বলেন না। কারণ, তাঁরা জানেন, রাজ্যব্যাপী অবিশ্বাসের চোরাবালিতে এই ইতিবাচক কথা ডুবে যেতে মুহূর্তমাত্র সময় লাগবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে নতুন সুযোগের দরজা-জানালা কষে বন্ধ করে রাখা।

এই লেখা প্রায় শেষ। আর এক বার কাজের মহিলাটিকে ডাকবেন? তাঁর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কী ভাবছেন, জানতে চাইবেন এক বার? মহিলা আপনাকে সম্ভবত স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। তিনি জানেন না। তাঁর চারপাশে যাঁদের তিনি সম্মানজনক কোনও কাজ করতে দেখেন— যেমন আপনাদের— তাঁরা ভিন্ গ্রহের মানুষ। তাঁর স্বজনের গণ্ডিতে সম্মানজনক পেশা পৌঁছয়নি। তাঁর ছেলেমেয়েরা, যারা হয়তো এখন স্কুলে যায়, তারাও জানে না ভবিষ্যতে কী করবে। বাড়ির পাশে শিল্প তৈরি হলে, মা-বাপকে সেই কারখানায় কাজ করতে যেতে দেখলে হয়তো জানত। হয়তো সেই কারখানার কোনও সহকর্মীর থেকে মা জেনে আসতেন আরও নতুন কোনও সুযোগের কথা, সন্তানের জন্য। কাজের অধিকার তো এ ভাবেই দুনিয়াটাকে বড় করে দেয়। বড় করে ভাবতে সাহস জোগায়।

আরও কত বছর অপেক্ষা করার পর শ্রমিক দিবস পশ্চিমবঙ্গে এই অধিকার নিয়ে আসবে?

**স্লোগান যতই তাঁদের জমির অধিকার রক্ষার কথা বলুক, ঠিকে কাজ করতে যাওয়া মহিলাদের সঙ্গে কৃষিতে অনিচ্ছুক যুবকদের তফাত নেই— কারও শ্রমের বাজারে নাম লেখানোর স্বাধীনতা নেই।**

## সম্পাদক সমীপেষু



# শুধু 'রাফ অ্যান্ড টাফ'?

শৈবাল করের লেখা 'কর্মসংস্কৃতি মাপা হবে কী করে' (২৫-৪) পড়ে মনে হল কিছু কথা সংযোজন করা দরকার। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে কর্মরত। দীর্ঘ দশ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে মনে হয়, সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্কৃতি পরিমাপ করা বাস্তবিকই অসম্ভব। 'কর্মসংস্কৃতি' ছোট্ট কথা, তবে অর্থ অনেক গভীর।

শৈবালবাবু তাঁর নিবন্ধে কর্মসংস্কৃতি পরিমাপের যে সম্ভাব্য নির্ধারক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার বাইরেও কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যেমন, সরকারি অফিসে গিয়ে ন্যূনতম ভাল ব্যবহারটুকুও পাওয়া যায় না— এই অভিযোগ বহু মানুষকে করতে শোনা যায়। সরকারি অফিস, পুরসভা কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা কাজে যাঁরা যাতায়াত করে, তাঁরা পরিষেবা পাওয়ার পাশাপাশি পরিষেবা প্রদানকারীদের তরফ থেকে একটু সুন্দর ব্যবহারও প্রত্যাশা করেন এবং দ্বিধা না-করে বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা না-পেয়ে হতাশ হন। ভাল ব্যবহার প্রদান কি কর্মসংস্কৃতির অঙ্গ নয়?

এখন অধিকাংশ সরকারি অফিসে প্রচুর পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সময়ের নিয়ম মেনে কর্মীরা অবসর নিচ্ছেন কিন্তু সেই শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ হচ্ছে না। ফলে, যাঁরা কর্মরত রয়েছেন তাঁদের উপর স্বাভাবিক ভাবেই কাজের চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত কাজ যদি সঙ্গে সঙ্গে সেরে ফেলা না-যায়, তবে পরিষেবা প্রদান বিঘ্নিত হবেই। সরকারি অফিসের শূন্য পদে দ্রুত লোকনিয়োগে এক দিকে যেমন সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে, ঠিক তেমনই 'ডু ইট নাউ' স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে সরকারি অফিসের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক হতে হবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে। ব্যবস্থাপনারই এক শাখা— 'কর্মী-ব্যবস্থাপনা'য় 'মেজর পাওয়ার প্ল্যানিং' কথাটি খুবই প্রচলিত। 'মনুষ্য শক্তি পরিকল্পনা' বা 'ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং'-এর অর্থ হল, কোন কাজে কত কর্মী দরকার তা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারণ করতে হবে। 'মনুষ্য শক্তি পরিকল্পনা'র বাস্তব প্রয়োগ সরকারি অফিসে প্রায় দেখাই যায় না। ফলে, একই সরকারি অফিসের কোনও কোনও দফতরে কর্মীরা কাজ পাচ্ছেন না। আবার অন্য দফতরে সামান্য সংখ্যক কর্মীর উপর পাহাড়প্রমাণ কাজের বোঝা চেপে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সঠিক 'মনুষ্য শক্তি পরিকল্পনা' কর্মসংস্কৃতিরই একটা অংশ।

সরকারি কর্মীর কাজ সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরটির ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল করে। প্রতিটি কর্মীর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয়টি বোঝানোর জন্য ট্রেনিং প্রোগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর নামে হঠাৎ করে স্বল্প দিনের জন্য কর্তৃপক্ষ 'রাফ অ্যান্ড টাফ' হয়ে উঠলে চলবে না। কারণ, কর্মসংস্কৃতি আনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কর্মসংস্কৃতিতে ছাপ ফেলে। কাজের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও মনোরম হলে কর্মীর কাজ করার উৎসাহ বাড়ে। অধিকাংশ সরকারি অফিস অপরিচ্ছন্ন, দীর্ঘ দিন রঙের প্রলেপ পড়ে না এবং সিঁড়ির দেওয়াল পান, গুটখার পিকে ভর্তি। সরকারি অফিস পরিচ্ছন্ন রাখায় সরকার ও সাধারণ মানুষের সমান ভূমিকা আছে।

তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার কর্মসংস্কৃতি পরিমাপের একটি উপায়। কোন কর্মী সারা দিনে কতটা কাজ করলেন তা সহজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে জানা সম্ভব। এখনও যে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার আসেনি, সেই ক্ষেত্রগুলি কম্পিউটারাইজড করলে সরকারি প্রশাসনিক কাজকর্ম গতি পাবে। কর্মসংস্কৃতি পরিমাপের আসল চাবিকাঠিটা রয়েছে সরকারি কর্মীদের হাতেই। কী ভাবে কাজ করলে 'পশ্চিমবঙ্গে সরকারি অফিসে কেউ কাজ করে না'— বদনাম ঘোচানো যাবে সরকারি কর্মীরা বিলক্ষণ জানেন। মনে রাখতে হবে, সরকারি পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে সরকারি দফতরে 'প্রফেশনালিজম' প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব।

*সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। হাওড়া-৬*